রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ : স্বামীজীর পরিকল্পনা ও লক্ষ্য

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

যেকোনও ভাবনাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য চাই সুষ্ঠু ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা, যা কালে ওই চিন্তাকে রূপ পরিগ্রহ করাবে ও তার স্থায়িত্ব দেবে। শ্রীবুদ্ধদেবের ধর্মসঙ্ঘ, যা এশিয়া মহাদেশের ক্ষেত্রে প্রথম একটি শুভ প্রচেষ্টা ছিল, সেটি কিছুকাল ভাল ফল প্রদান করলেও অদূর ভবিষ্যতে তার পরিণতি শুভ হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ অনেক চিন্তাভাবনা করেছিলেন সঙ্ঘ গঠন নিয়ে। ভগিনী ক্রিস্টিন জানিয়েছেন, স্বামীজী বিদেশে প্রথমবার থাকাকালীনই 'to organize or not to organize' এই দোলাচলে স্থিত ছিলেন। তাঁর গভীর মননে এ-সত্য ধরা পড়েছিল, একটি স্থায়ী সংগঠন ছাড়া বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনন্যসাধারণ মৌলিক ধর্মীয় যুগোপযোগী সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকরী করা যাবে না। আবার কোনও সঙ্ঘের মাধ্যমে তাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে পাছে সাম্প্রদায়িকতার ভাবটি এসে পড়ে এবং সন্ন্যাসের স্বাধীন জীবনাদর্শ কিছুটা ব্যাহত হয়, এ-বিষয়েও তিনি সন্দিহান হয়েছিলেন। পরে অবশ্য দুটির মধ্যে প্রথমটিই তাঁর যৌক্তিক সমর্থন লাভ করে এবং তিনি প্রস্তুত হন সঙ্ঘ স্থাপনের জন্য।

যেকোনও ধর্ম সংগঠনের পক্ষে একথা সত্য বা অপরিহার্য যে, কোনও বিশেষ ধর্মমত, পদ্ধতি বা কর্মকাণ্ড অবলম্বনে তাকে গড়ে তুলতে হয়। তখন সেটি একটি সম্প্রদায়ের রূপ ধারণ করে, অন্যান্য অনুরূপ সম্প্রদায়ের থেকে তার পার্থক্য রচিত হয় এবং ভাবগত বিভেদ থেকে বিদ্বেষ বা প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটে, যা যেকোনও ধর্মজীবনের পক্ষেই অগ্রগতির পরিপন্থী, যদি ধর্মের মূলগত সত্যের প্রতি সঙ্ঘের সভ্যদের দৃষ্টি স্বচ্ছ না থাকে। তখন ব্যক্তির নিজ জীবনের ধর্মানুশীলনের পথটি যেমন রুদ্ধ হয়ে যায়, তেমনি সংসার-সমাজজীবনেরও ক্ষতি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মমত প্রসঙ্গে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছিলেন :

১। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম সম্বন্ধে কোনও একটি বিশেষ মত ও পথের সমর্থনে কথা বলেননি, বরং সকল প্রকার ধর্মমতের মধ্যে একটি মূল ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সবগুলিরই সত্য প্রতিপাদন করেছেন নিজজীবনে তাদের বাস্তবায়িত করে।

২। শ্রীরামকৃষ্ণ সংসার বা বস্তুজীবন ও ধর্মজীবনের মধ্যে কোনও বিশেষ ব্যবধান রচনা করেননি, যার ফলে একটি থেকে অন্যটিতে

উত্তরণের পথ রুদ্ধ হয়নি। রাজা মহারাজের ভাষায়, এখন জীবলোক থেকে শিবলোকে অনায়াসে যাওয়া যাবে।

৩। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্যের প্রতি জোর না দিয়ে, ঈশ্বরতত্ত্ব বা অদ্বৈততত্ত্বের ধ্যান, স্মরণ মননের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন; ধর্মকে কোনও বিশেষ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে দেননি।

৪। রামকৃষ্ণদেব ধর্মচর্চায় একটি নতুন পথ সংযুক্ত করে দিয়েছেন, তা হল সেবাকর্ম ও তার অনন্ত বিস্তৃতি, যেখানে কর্মই ধর্ম হয়ে যায়, মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দেয়, যেখানে ঈশ্বর ও জীবের সহজ স্বাভাবিক মেলবন্ধন ঘটে। এখানে তাঁর শিবজ্ঞানে জীবসেবার নির্দেশটি স্মর্তব্য।

৫। রামকৃষ্ণদেবের কোনও কথাই সনাতন হিন্দুধর্মের বা ঐতিহ্যগত জীবনযাপনের বা ঔপনিষদিক ভাবধারার বিরোধী নয়, আশ্চর্যভাবে সেগুলির অনুকূলেই তিনি রায় দিয়েছেন।

স্বামীজী তাঁর গুরুর এই অতীব মৌলিক, উদার, স্বাধীন ও সমন্বয়ী ধর্মোপদেশগুলিকে মানবকল্যাণে কার্যকরী করা একান্তভাবে প্রয়োজন বুঝেই সঙ্ঘস্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কারণ সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া তাঁর মহান উপদেশগুলির ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্ব বজায় রাখা যাবে না, অন্যথায় তাঁর দীর্ঘ, কঠোর সাধনাও বৃথা যাবে। স্বামীজী বুঝেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের যুগোপযোগী সহজ সরল ধর্মীয় ভাবধারা সাধারণ মানুষকেও ধর্মজীবন যাপনে উৎসাহ ও প্রেরণা দেবে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্বামীজী ১৮৯৭ সালের ১ মে বলরামবাবুর গৃহে এক সভা আহ্বান করেন, যেখানে তাঁর কয়েকজন গুরুভাই, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কিছু গৃহী ভক্ত ও স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত হয়েছিলেন। স্বামীজী ওইদিন ঘোষণা করেন, ''নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে যে সঙ্ঘ ছাড়া কোনও বড় কাজ হতে পারে না, আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বছরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার ঘটেছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা এ-কার্যে সহায় হোন।'' এই সংগঠনের নাম দেওয়া হল 'রামকৃষ্ণ প্রচার' বা 'রামকৃষ্ণ মিশন'। এর উদ্দেশ্যগুলি এভাবে নিরূপিত হয়েছিল—

১। যেসব তত্ত্বোপদেশ মানবসাধারণের হিতার্থে রামকৃষ্ণদেব বিতরণ করে গেছেন ও নিজ জীবনে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, সেগুলির প্রচারের দ্বারা মানবের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতি সাধন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

২। জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক বেদ-উপনিষদ-ভিত্তিক সনাতন ধর্মেরই রূপান্তর মনে করে সকল প্রকার ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সখ্য স্থাপনের যে-মহান নিদর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ রেখে গেছেন—('যত মত তত পথ' বা 'অনন্ত মত, অনন্ত পথ' এই উক্তির মাধ্যমে)—সেই মহান সত্যের প্রচারই হবে এই সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য।

৩। মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত ব্যক্তি শিক্ষিতকরণ এবং ধর্মের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও শ্রমজীবীদের কর্মে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান (কর্মে ছোট বড় নেই, সব কর্মই ধর্মের অঙ্গ ও উন্নতির কারণ)—এই প্রচারের অঙ্গ বলে গৃহীত হল।

৪। উপনিষদ বা বেদান্তের অন্তর্গত দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত ভাব যেভাবে ক্রমান্বয়ে ঠাকুরের জীবনে রূপায়িত হয়ে ওই তিনটি পথকে সুসমন্বিত করেছিল, জনসমাজে তার প্রচার ও প্রবর্তন এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য।

৫। ভারতে এ-জীবনাদর্শ প্রচারের জন্য উপযুক্ত

প্রচারক তৈরি করে, বিভিন্ন নগরে নগরে আশ্রমাদি স্থাপন করে কাজটিকে সফল করে তোলার দিকে সম্যক দৃষ্টি দিতে হবে এবং ভারতের বাইরেও এর সম্প্রসারণ করতে হবে যাতে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে এক আন্তর্জাতিক সুমহান ঐক্য স্থাপিত হয়ে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করতে পারে। স্বামী গম্ভীরানন্দজী 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে আরও দুটি বিষয় যোগ করেছেন সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালীর মধ্যে :

১। মিশনের আদর্শ বা লক্ষ্য যেহেতু কেবল আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক, অতএব রাজনীতির সঙ্গে এর কোনওপ্রকার সম্বন্ধ থাকবে না।

২। মিশনের উদ্দেশ্যগুলির প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল, যাঁরা বিশ্বাস করেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতে কোনও বিশেষ কার্য সাধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁরাই শুধুমাত্র এই সঙ্ঘের সদস্য হতে পারবেন।

এই মিশনের যে-উদ্দেশ্যগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার মধ্যে দুটি মূল বা প্রধান ভাব হল—

১। ধর্মীয় সহাবস্থান। স্বামীজীর সমকালে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বেষভাব প্রকট ছিল, সেটি লক্ষ করে এই বিরোধের মূলোচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুসরণে আরও একটি সম্প্রদায় যাতে না গড়ে ওঠে সেদিকে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বিত ধর্মাদর্শ—'যত মত তত পথ' থেকে কোনও সংকীর্ণ ভাবধারা অনুসৃত হতে পারে না, হলে 'অনন্ত ভাবময়' ঠাকুরকে গণ্ডিবদ্ধ করে ফেলতে হয়।

২। ধর্মীয় উপদেশের বাস্তব প্রয়োগ অধ্যাত্ম-জীবনের উন্নতির কারণ। তাই যেকোনও প্রকার সেবাকর্ম—শারীরিক, মানসিক বা পারমার্থিক—অবস্থাভেদে প্রয়োজন বুঝে, তার প্রতিকারার্থে এগিয়ে যাওয়া জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে। সেবা এখানে সাধনার পর্যায়ে গণ্য হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুকে তীর্থপথের অর্থব্যয় কম করে স্থানীয় দীন-দরিদ্র মানুষদের আহার ও বস্ত্র দানে বাধ্য করেছিলেন, না করলে তীর্থে যাবেন না এমনই জেদ করেছিলেন। সেদিন তীর্থের ধর্মাচরণকে গুরুত্ব না দিয়ে সেবাকর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার যে-দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছিলেন, তারই অনুসরণে যেকোনও প্রকার সেবাকেই ধর্মের অঙ্গীভূত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সেবাদর্শ ধর্মজীবনকে পুষ্ট ও পূর্ণ করে, তার ক্ষতি সাধন করে না। তা না হলে রামকৃষ্ণদেব স্বামীজীকে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' করার অভিনব ও অভূতপূর্ব অধ্যাত্মসাধনার নির্দেশ দিতেন না। স্বামীজী শ্রীগুরুর ওই ভাবময় উক্তিটিকে গভীর মননের দ্বারা 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই মহাবাক্যে ব্যক্ত করেছেন—যার দ্বারা ব্যষ্টিমুক্তি ও জগতের হিতসাধন একইসঙ্গে হবে। এরই সঙ্গে, শ্রীবুদ্ধদেবের যে-মন্ত্রটি তাঁর জীবনবেদ ছিল—'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়'—স্বামীজী তাকেও যুক্ত করে, মানবজীবনের expansion বা বিস্তৃতির পথটি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যেখানে মানবের চরম সার্থকতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁর যুগের থেকে অনেকই এগিয়ে যুগধর্মকে অবলোকন করেছিলেন এবং স্বামীজীকে নবযুগ প্রবর্তনে সহায়করূপে গ্রহণ করে তাঁর মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন, সেকথা বুঝেই স্বামীজী এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন যে, ধর্ম ও কর্ম দুটি পৃথক ধারা নয় বা অধ্যাত্মজীবনের দুটি ভিন্ন পথ নয়, বরং একটিকে আর একটির পরিপূরকরূপেই গ্রহণ করতে হবে, তা না হলে ধর্মজীবন তার সর্বজনীন গুরুত্ব হারাবে এবং কর্মজীবনও বিফল হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এইরকম ধর্মজীবনের গঠনকারী হয়ে, ব্যক্তিমানবকে বিশ্বমানবের মর্যাদায় উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শের মাধ্যমে বা সঙ্ঘের লক্ষ্য হিসাবে স্বামীজী একেই আদর্শ অধ্যাত্মজীবনের

তকমা দিতে চেয়েছেন। অতীতকালে ধর্মজীবনের লক্ষণ নিরূপিত হয়েছিল এভাবে—'Journey of the alone to the alone'। কিন্তু শুধু এই পথকেই অবলম্বন করলে বৃহত্তর জনসমাজ অবহেলিত হয়ে থাকবে, যেমনটি পূর্বে দেখা গেছে। স্বামীজী শ্রীগুরুর দৃষ্টি অবলম্বনে দেখেছিলেন মানবসমাজ সেই মহামায়ার ছায়ামাত্র। ছায়াকে ধরেই কায়াতে পৌঁছতে হবে। স্বামীজী লিখেছেন, ''The desire to jump out of ourselves, the struggle, to objectify the subject", এটিই হল সমাজগঠন বা বিবর্তনের মূল সত্য। তাই কর্মই অগ্রগতির পথ, কর্মই ধর্ম। স্বামীজীর রচনাবলির ভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতা এই ভাবটিকে অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন : ''No distinction, henceforth, between sacred and secular. To labour is to pray"। অন্যত্র লিখেছেন : ''Now Karma or Service is no longer a destiny, but an opportunity"।

বলরামবাবুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার প্রথম সভা আয়োজিত হওয়ার কয়েক দিন পূর্বেই স্বামীজী তাঁর শিষ্য নিত্যানন্দের পরামর্শে মঠে যোগদানকারী নবাগতদের ধর্মজীবন গঠনের জন্য কিছু নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করান। মঠ তখন আলমবাজারে। পরে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে মঠ উঠে এলে ওই নিয়মগুলিকেই আরও বিস্তারিতভাবে লেখা হয়, এবং এতে মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের জীবনযাপন ও সন্ন্যাসের আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সঙ্ঘস্থাপনের উদ্দেশ্য বা আদর্শ পরিষ্কারভাবে বলা হয়—নিজের মুক্তি সাধন ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণসাধনের জন্য শিক্ষিত হওয়া। তাই মঠে সর্বদা বিদ্যাচর্চা চলবে, ত্যাগ ও তপস্যার ভাব অব্যাহত থাকবে ও সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমন্বয়ী ভাবধারার চর্চা ও তার প্রচারকাজ চলতে থাকবে। স্বামীজীর মতে প্রচারের দ্বারা সঙ্ঘের পুষ্টিসাধন হয়। সমাজসংস্কারের দিকে অর্থাৎ সমাজের কুরীতি বা কুপ্রথা দূরীকরণে শক্তি ক্ষয় না করে, জনগণের কাছে ধর্মের প্রকৃত অর্থ জ্ঞাপন করা এবং এই ধর্মদান সহ নানাপ্রকার সেবামূলক কাজ যেমন অন্নদান, বিদ্যাদান ও প্রাণদান—অর্থাৎ আর্ত, পীড়িত অশক্ত মানুষদের পাশে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সেবাশুশ্রূষা করা—এগুলির ওপরেই স্বামীজী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন।

স্বামীজী বুঝেছিলেন ধর্মই ভারতের জীবনচর্যার মূল সুর। ধর্মের ভিতর দিয়ে না গেলে, বা তাকে ভিত্তি না করলে কোনও ভাব সহজে গ্রহণীয় হবে না এদেশে। তাই ধর্মভাব অর্থাৎ ঈশ্বরকেন্দ্রিক জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, নিষ্কামকর্ম—যে-পথগুলি ধর্মের জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলিকে অবলম্বন করেই নিজ মুক্তি সাধনের চেষ্টা এবং সেবা—উভয়দিকেই অগ্রসর হতে হবে। কোনও সংকীর্ণ মনোভাব বা গোঁড়ামি বা কোনও সাম্প্রদায়িক প্রথাকে প্রশ্রয় দিয়ে মঠকে 'ঠাকুরবাড়ি'তে পরিণত করা যাবে না। অর্থাৎ প্রচলিত ধর্মবিধি মেনে এই রামকৃষ্ণ মঠের কার্যাবলি শুধু ঠাকুরের নামগুণগান, ভজন-কীর্তন, পূজা উপাসনা, প্রসাদাদি বিতরণ—এসবের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না। মঠটি যেহেতু বিশ্বজনীন কল্যাণার্থে পরিকল্পিত, তাই ভারত ও ভারতেতর দেশগুলির মধ্যে সখ্যভাব বজায় রেখে, উদারভাব নিয়ে সমাজের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণির মধ্যে বৈষম্য, ছুঁৎমার্গ, বা জাতি-বর্ণাদি ভেদ ইত্যাদি দূরীকরণে সচেষ্ট হতে হবে এই সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের। স্বামীজী এইভাবে সঙ্ঘের ত্যাগব্রতীদের জীবনের মূল সুরটি বেঁধে দিলেন এবং বললেন, যারা জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও নিষ্কামকর্ম—এগুলির সব কয়টি বা দুটি বা তিনটি মার্গ অবলম্বনে নিজ ধর্মজীবন অতিবাহিত করতে প্রস্তুত এবং একইসঙ্গে সচ্চরিত্র, ঈর্ষাশূন্য ও গুরু-অধ্যক্ষের আদেশ পালনে তৎপর, তারাই

শুধুমাত্র এই অসাম্প্রদায়িক সঙ্ঘের বা রামকৃষ্ণ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। এক কথায়, এই সঙ্ঘ এমন একটি কেন্দ্র হবে যেখানে একজন ব্যক্তি নিজেকে আদর্শ সন্ন্যাসিরূপে তৈরি করবে ও নিজের জীবন দিয়ে জগতের কল্যাণ সাধন করবে। 'Be and Make' এইটিই ছিল স্বামীজীর 'Motto' বা তাঁর জীবনাদর্শের মূল কথা।

১৮৯৭ সালের ১ মে মিশন প্রতিষ্ঠার দিন ভক্তদের কাছে এই সমিতির আদর্শ ও কার্যাবলির কথা বা তার বহিরঙ্গ সাধনের রূপরেখা সম্বন্ধে স্বামীজী নিজ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু যাঁরা প্রধানত এই মহান কার্যটি পরিচালনা করবেন, সেইসব ব্রতধারী সাধু-ব্রহ্মচারীদের এই উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে পূর্বে অবহিত করাতে হবে এবং সেই ধাঁচে জীবনের নির্মাণকাজটি করতে হবে, তবেই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হতে পারবে। স্বামীজী তাই অন্তেবাসী সদস্যদের জন্য কিছু নিয়মের প্রবর্তন করেন, যার মধ্যে শিক্ষিতকরণ অর্থাৎ শাস্ত্রাদির চর্চা, ধ্যানজপ, সেবাকার্যের উপযোগী সুস্বাস্থ্যগঠন—এসবও অন্তর্ভুক্ত হল। অর্থাৎ স্বামীজীর মতানুসারে একটি যথার্থ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য যা যা করা প্রয়োজন, সবই এতে স্থান পেল। তবে স্বামীজী বারংবারই বলতেন, এসব নিয়মকানুন প্রাথমিকভাবে জীবনগঠনে কাজে লাগলেও, প্রকৃত সন্ন্যাসী নিয়মের নিগড়ে বাঁধা থাকবে না, সে স্বাধীন ও অনন্তের অভিসারী হবে।

এই সঙ্ঘের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য—

১। ধর্মচর্চার সঙ্গে এই প্রথম সেবাকর্মের যোগ সাধিত হল। যে-অদ্বৈত জ্ঞান অবলম্বনে এই সঙ্ঘ পরিচালিত হবে—ব্যক্তিজীবনে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে—তার সঙ্গে দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতকেও মিলিয়ে দেওয়া হল, ভক্তি, কর্ম ও ঈশ্বর প্রণিধান সহ।

২। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেহেতু কালীসাধনা বা সাকার উপাসনা দিয়ে ধর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং তাতে সিদ্ধিলাভ করে পরবর্তীতে শংকরপন্থী সন্ন্যাসী শ্রীমৎ তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নিয়ে বিশুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞানে আরূঢ় হয়েছিলেন, সেই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত এই সন্ন্যাসাশ্রমে, বেদবিহিত না হলেও, সাকার উপাসনা বা অন্যান্য প্রতিমাপূজা ও শ্রীশ্রীঠাকুরেরও পূজার প্রচলন রইল। শুধুমাত্র মায়াবতী আশ্রমে স্বামীজী এইরকম দ্বৈত-উপাসনা নিষিদ্ধ করেছিলেন।

৩। ভারতে ও ভারতের বাইরে অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করে এই সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনন্যসাধারণ ধর্মজীবন ও উদার বাণী প্রচারের দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে যথার্থ ধর্মপথে পরিচালিত করা, এই সঙ্ঘের অন্যতম কার্য বলে গৃহীত হল। এই প্রথম সমাজসচেতনতা হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হল।

৪। প্রাচীন ধারা অবলম্বনে সাধু আর শুধুমাত্র 'রম্‌তা' রইলেন না। 'বহতা পানি ও রম্‌তা সাধু'র মধ্যে সমীকরণের যে-ধারণাটি পূর্বে প্রচলিত ছিল, সেটি আর রইল না। সাধুর জন্য এতদিন যে-নির্দিষ্ট একক নিভৃত জীবন ছিল, ধ্যানধারণার সেই জীবন থেকে সরে এসে সন্ন্যাসী বিরাটের সমবেত জীবনপ্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীমার ঐকান্তিক প্রার্থনায় ও আশীর্বাদে মঠস্থাপনার মাধ্যমে স্থায়ী

আহার-বাসস্থানেরও এক শান্তিপূর্ণ স্থান লাভ হল।

৫। এই প্রথম একটি সন্ন্যাসিসঙ্ঘের কর্তৃত্ব দেওয়া হল একজন বিবাহিতা নারীর হাতে, যিনি লৌকিকভাবে শিক্ষিতা না হলেও, আধ্যাত্মিকতার শীর্ষে আসীন ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণদেবের পত্নী শ্রীসারদা দেবী, যাঁর সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেন, ''শ্রীরামকৃষ্ণদেব বরং যান ক্ষতি নেই, মাতা ঠাকুরানি গেলে সর্বনাশ।'' তিনি শ্রীমাকে দেবী বগলার অবতার বলেও চিহ্নিত করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁকে জ্ঞানের দেবী সরস্বতীরূপে নির্দেশ করেছেন—''ও সারদা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।'' আমরা দেখি শ্রীশ্রীমার সমগ্র জীবনটি এসব কথার সত্যতা প্রমাণ করে স্বমহিমায় স্থিত হয়ে আছে। স্বামীজী মিশন প্রতিষ্ঠার দিনই সর্বসমক্ষে জানিয়েছিলেন, ''এই যে সঙ্ঘ স্থাপিত হতে চলেছে, শ্রীশ্রীমাই হবেন এর রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী। তিনি আমাদের সঙ্ঘজননী।'' তাঁকে শুধু 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী' বা 'গুরুপত্নীরূপে' দেখতে বারণ করেছেন। স্বামীজী নির্দ্বিধায় শ্রীমার হাতে এই সন্ন্যাসিসঙ্ঘের ভার তুলে দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে তিনি মাকে কেন্দ্র করে একটি নারীসঙ্ঘেরও সূচনার কথা ভেবেছেন ও বলেছেন। তাঁর সেই স্বপ্নটি তৎকালে পূরণ না হলেও পরে 'শ্রীসারদা মঠ' নামে এই মঠের প্রতিষ্ঠা হয়।

এই সন্ন্যাসিসঙ্ঘের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল—শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু গৃহী ভক্ত, যাঁরা তাঁকে একান্তভাবে আশ্রয় করে সংসারজীবন যাপন করেছেন, তাঁরাও তাঁর আরব্ধ কার্যের ভার প্রাপ্ত হলেন ও ঠাকুরের দিব্য জীবনাদর্শের প্রচারে ব্রতী হলেন। স্বামী প্রভানন্দজী লিখেছেন, ''এই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ হল সন্ন্যাসী ও গৃহীদের যৌথ সংস্থা''—যেটি পূর্বে দৃষ্ট হয়নি।

স্বামীজী বলেছিলেন, তিনি এমন একটি যন্ত্র চালিয়ে দিয়ে যেতে চান যা মানবসমাজের কাছে উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বিতরণ করে তার সর্ববিধ উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হবে। আমরা মনে করে নিতে পারি, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন তাঁর সেই যন্ত্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্ত উদার ভাবরাশির শক্তি তাকে ক্রিয়াশীল করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সর্বত্র এক নবভাববিপ্লব আনয়নের দ্বারা তার সমৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। স্বামী গম্ভীরানন্দজী 'স্বামীজীর সাফল্য' প্রবন্ধে লিখেছেন, ''রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্বামী বিবেকানন্দের এক অপূর্ব অবদান সমগ্র জগতের কাছে এবং এই মিশনই যে শুধু সাফল্য অর্জন করেছে তাই নয়, সন্ন্যাসিসঙ্ঘের এই কর্মযোগের অনুপ্রেরণায় আরও কত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে দেশের ও দশের কল্যাণে।''

স্বামী গম্ভীরানন্দজী আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সচেতন করেছেন 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, মঠ-মিশনের এই কর্মমার্গকে কিন্তু গীতার কর্মযোগের সমার্থক বলে গ্রহণ করা চলে না। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ঈশ্বরার্থে কর্মফল অর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে স্পষ্টভাবেই দ্বৈতবাদী দর্শনের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু স্বামীজীর কর্মে পরিণত বেদান্ত বা ব্যাবহারিক বেদান্তে নিজের জন্য কর্মফল অর্জনান্তে ঈশ্বরে অর্পণের কথা উঠতে পারে না কারণ এক্ষেত্রে পুরো প্রচেষ্টাই ঈশ্বরকেন্দ্রিক। সেব্য ও সেবক উভয়ই যেখানে ঈশ্বর, সেখানে কর্মফলের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। স্বামীজী অনেকবারই ঘোষণা করেছেন মানবচৈতন্য ও ঈশ্বরচৈতন্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। অজ্ঞরা যাকে মানুষ বলে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দর্শনে তাকেই ঈশ্বর বলা হয়েছে। আত্মার একত্বই এখানে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত এবং সেটিই স্বামীজী প্রবর্তিত কর্মকাণ্ডের মূল সূর।

দ্বিতীয়ত শাস্ত্র বা পুরাণে যাগযজ্ঞাদি বা

ইষ্টাপূর্তাদি কর্মকেই ভগবান লাভের উপায় বলা হয়েছে। স্বামীজীর মতে যেকোনও শুভকর্মই নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হলে তা ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় হতে পারে, তাই যেকোনও কর্মই পূজায় পরিণত হতে পারে।

তৃতীয়ত আচার্য শংকর বলেছেন যে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় ও তার ফলে ভক্তি, জ্ঞানের উদয়ে ঈশ্বরদর্শন ঘটবে বা মুক্তি লাভ হবে। স্বামীজী এই পরম্পরাক্রমে 'মুক্তি' স্বীকার করেননি। ঈশ্বরার্থে যেকোনও কর্মই, যাকে নিষ্কাম হতেই হবে, স্বামীজী তাকে অন্য-নিরপেক্ষ মুক্তিমার্গরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে এই কর্ম স্বাধীন আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত সাত্ত্বিক বিলাস, তাই দাসজনোচিত নয়, প্রভুজনোচিত। স্বাধীন আত্মার কর্তব্য বলে কিছু হতে পারে না, কারণ কর্তব্যবুদ্ধিও পরাধীনতার দ্যোতক।

সুতরাং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সর্বভূতে একত্ব দর্শন, বা বলা যেতে পারে অদ্বৈতবাদের সমর্থন ও গ্রহণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে—ধর্মেকর্মে। এ-প্রসঙ্গে একটি কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 'ব্যাবহারিক বেদান্তে'র ধারণার মূলবীজটি নিহিত ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি অসাধারণ উক্তির মধ্যে—''অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা কর।'' অদ্বৈত জ্ঞানের ভিতের ওপরেই যে সকল কর্মের সার্থকতা, শান্তি ও আনন্দলাভ, মানবজীবনের প্রকৃত সমৃদ্ধি সম্ভব, এ-সত্যের আঁচ শ্রীশ্রীঠাকুরের ওই উক্তির মধ্যেই ধরা আছে। স্বামীজী তাকেই, বলা বাহুল্য যথোচিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সহ, আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। রামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসীদের যে-আভ্যন্তরীণ জীবনযাপন, আর মিশনে যে-জনকল্যাণকর্ম, উভয়েরই মূল নীতি রইল অদ্বৈততত্ত্ব। অদ্বৈত আত্মার বিচিত্র বিকাশ বোধে নিজেকে ও জগতের সকলকে দেখা ও সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উদার প্রেমময় ভাবে সকলের সেবা করা, এটিই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কর্মকাণ্ডের মূল ভিত্তি যার পূর্ণ পরিণতি আত্যন্তিক দুঃখমুক্তি বা আত্মমুক্তিলাভ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসুস্থতার সময়ে তাঁর ত্যাগী যুবক সন্তানেরা কাশীপুরের বাড়িতে থেকে তাঁকে হৃদয়ের ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা উজাড় করে দিবারাত্র সেবা করেছিলেন। সেসময়েই ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে ওইসব ছেলেদের একত্রে রেখে ধ্যান-ভজন-তপস্যা সহায়ে ঈশ্বরলাভে অগ্রসর হতে আদেশ দিয়েছিলেন। মনে করা হয়ে থাকে তখনই এই সঙ্ঘভাবনার সূত্রপাত, যার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয় বলরামবাবুর গৃহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি লিখনে জানিয়েছিলেন, ''নরেন শিক্ষে দিবে যখন ঘরে বাইরে হাঁক দিবে।'' বাইরের 'হাঁকে' তো স্বামীজী বিশ্বজয় করেছিলেন, আর ঘরের 'হাঁকে' রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ স্থাপনে আহ্বান করলেন অন্তরঙ্গ ভক্তজন ও গুরুভাইদের, উভয়ক্ষেত্রেই নবযুগধর্মভাব শিক্ষা দিয়ে।

১৮৯৭, ১ মে যে-বীজটি বপন করা হল, কালে তা মহীরুহের আকার ধারণ করে ফলে ফুলে সৌরভ বিতরণ করে, সহস্র শাখায়িত হয়ে বিশ্বের সর্বত্র—দূরতম প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ে আপামর জনগণের ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনে স্থির রয়েছে স্বমহিমায়—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব নরদেবলীলার সাক্ষ্য বহন করে।

যেসকল ত্যাগব্রতী, সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত থেকে এই মহান যুগচক্র পরিচালনে সহায়ক হয়েছেন তাঁরা ধন্য। যাঁরা বহিরঙ্গনে থেকে এই সুমহান আদর্শে জীবন গঠনে তৎপর হয়েছেন, তাঁরা ধন্য। যাঁরা এই সঙ্ঘের নিষ্কাম সেবা-সাধনায় সেব্য হয়ে সেবা-সহায়তার স্পর্শলাভ করেছেন তাঁরাও ধন্য। সর্বোপরি ধন্য এই যুগ, এই দেশ, জাতি, যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামী বিবেকানন্দের মতন যোগ্যতম শিষ্য সহ জন্ম পরিগ্রহ করেছেন।